

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)****A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 884 - 891

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

তিনকড়ি ও বিনোদিনী দাসীর অভিনয় : রূপ ও রীতি

সোনালী দেবনাথ

গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: sonalidebnath303@gmail.com**Received Date** 20. 01. 2026**Selection Date** 10. 02. 2026**Keyword**

Theatre,
19th Century,
Acting, Method,
Natyashastra,
Performance,
Sattwik Abhinoy,
Womanhood.

Abstract

When Gerasim Lebedev first introduced Bengali theatrical performances in the nineteenth century, women also acted on stage. After the establishment of the National Theatre in 1872, women did not perform on stage for a long time. During this period, Michael Madhusudan Dutt and Ishwar Chandra Vidyasagar were shaping the world of theatre. While Madhusudan Dutt supported the idea of women acting on stage, Vidyasagar could not endorse it, because at that time, women from respectable families did not participate in theatrical performances. Actresses had to be brought in from brothels. Vidyasagar could not support the idea of women playing female roles in plays, fearing that the sanctity of the theatrical stage would be compromised if such women were involved. However, audiences only attended plays when there were female actresses; otherwise, the halls remained empty. Therefore, out of necessity, directors began giving opportunities to actresses. And in this way, one by one, women from the red-light areas started acting in plays, learning to live a new life, free from their abhorrent past. Of the two actresses discussed in the present article, Tinkari entered the world of acting at her mother's behest. Her mother brought her to the theatre stage to rescue her from a life of hardship. From there, she never had to look back, continuing her acting education throughout her life as a devoted student of Girish Ghosh. The other actress, Binodini Dasi, also came from a red-light area and entered the acting profession, both of them quickly became renowned. At that time, although foreign styles were followed in stage performances, the plays themselves were chosen based on stories from Sanskrit literature and mythology. Hints of how their acting style and methods-maintained consistency with the grammar of acting in our indigenous dramatic tradition can be found in their memoirs. In the *Natyashastra* (treatise on dramaturgy), acting is divided into four categories: *Angika* (physical expression), *Vachika* (verbal expression), *Sattvika* (emotional expression), and *Aharya* (costume and makeup). A performance becomes complete and perfect through the combination of gestures, vocal intonation, and stage design – all working together. However, the best of all is 'Sattvika' acting (acting based on inner emotions and feelings). This article discusses how the actresses of that era, following their

guru Girish Ghosh, progressed from the level of physical acting to reaching the pinnacle of self-improvement in their craft.

Discussion

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে হেরাসিম লেবেদেফ বাংলায় নাট্য অভিনয়ের যে ধারার সূচনা করেছিলেন তা পূর্ণতা পেয়েছিল ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মাঝের দীর্ঘ সময়টিতে নবীন বসু, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত ধনী গৃহ প্রাঙ্গণে নাটকের অভিনয় হলেও সেখানে সাধারণের প্রবেশের অধিকার ছিল না। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে বিলেত ফেরত মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটক দেখে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন। এই ধরনের শখের থিয়েটারে বাংলার নিজস্ব যাত্রাপালার ঢঙের নাট্যাভিনয় দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, বিলেতের নাটক যে জায়গায় পৌঁছেছে তার থেকে অনেকখানি পিছনে পড়ে রয়েছে বাংলা নাটক। বাংলা ভাষায় যথাযথ নাটকের অভাব বোধ থেকেই মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করেন। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই নাটকে সংস্কৃত নাট্য ধারার কিছু প্রভাব থাকলেও মূলত বিলেতি ঢঙে - সুসংবদ্ধ প্লট, স্বাভাবিক চরিত্র সৃজন এবং প্রাণময় সংলাপের সহযোগে রচিত হয়ে এই নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়েছিল। বিলেতি নাটকের মত দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছিল এবং ইংরেজ শিল্পীরাই সেই দৃশ্যপট আঁকেন। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে এসে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সময়েও এই ধারাকেই মান্যতা দেওয়া হয় এবং বিলেতের নাটকে যেমন পুরুষরাই মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন তেমন ভাবে এখানেও পুরুষরাই মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতে থাকেন। যদিও লেবেদেফের সময়ে নারীরা অভিনয় করতেন, আমাদের দেশীয় যাত্রা বা ঝুমুরের আসরেও নারীরা অভিনয় করতেন। কিন্তু 'সাধারণ রঙ্গালয়' প্রতিষ্ঠার পর বেশ কয়েক বছর সেখানে নারীবর্জিত অভিনয় চলেছিল। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে 'দি ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে' বিদ্যাসুন্দর পালায় দুইজন নারী অভিনয় করেছিলেন। তবে নিয়মিত নারী অভিনেত্রীদের দিয়েই নারী চরিত্রের অভিনয় প্রথম শুরু হয় 'বেঙ্গল থিয়েটারে'। এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তবে থিয়েটারে নারী অভিনেত্রীর প্রবেশ উচিত কিনা এই নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে মধুসূদন দত্তের তর্ক বাঁধে। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের নায়ক বিদ্যাসাগর মহাশয় মঞ্চে নারীর প্রবেশকে মান্যতা দেননি। সমাজের যে স্তর থেকে এই অভিনেত্রীরা উঠে এসেছিলেন তাঁদের প্রবেশে রঙ্গমঞ্চে পবিত্রতা নষ্ট হবে এমনটাই ভেবেছিলেন বিদ্যাসাগর। এই নিয়ে 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল লেখা হয় -

“সিমলার কতকগুলি ভদ্র সন্তান বেঙ্গল থিয়েটার নাম দিয়া আর একটি থিয়েটার খুলিতেছে।... যে যে স্থানে পুরুষদিগকে মেয়ে সাজাইয়া অভিনয় করিতে হয় সেইখানে আসল একেবারে সত্যিকারের মেয়েমানুষ আনিয়া নাটক করিলে অনেক টাকা হবে এই লোভে পড়িয়া তাহারা কতকগুলি নটীর অনুসন্ধানে আছেন।... মেয়ে নটী আনিতে গেলে মন্দ স্ত্রী লোক আনিতে হইবে, সুতরাং তাহা হইলে শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়াইবে। কিন্তু দেশের পক্ষে তাহা নিতান্ত অনিষ্টের হেতু হইবে।”

কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও মঞ্চে নারীর অনুপ্রবেশ আটকানো যায়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে ক্ষেত্রে বাজার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যে থিয়েটারে নারী অভিনেত্রী আছে সেই থিয়েটারেই দর্শকের ভিড় বেশি হতে থাকে ফলে থিয়েটার কর্তারা নারীদের গ্রহণ করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে কমবয়সী বালকদের নারী সাজিয়ে অভিনয় করিয়ে অভিনয়ের সত্যতা বজায় রাখাও সম্ভব হচ্ছিল না ফলে গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর মত নাট্য সাধকরা নারী অভিনেত্রীদের গ্রহণ করে নেন।

তবে এই সময়ে নাটকে অভিনয় করতে যেসব অভিনেত্রীরা এলেন তাঁরা কেউই ভদ্র ঘর থেকে এলেন না। সেই সময়ে গৃহস্থ বাড়ির ক্ষেত্রে 'অন্দর' আর 'বাহিরের' স্পষ্ট ভেদরেখা ছিল। 'বাহির' পুরুষের জন্য আর 'অন্দর' স্ত্রীলোকের জন্য। এই অন্দরের স্ত্রীলোকেরা কখনোই বাহিরে আসতে পারতেন না ফলে তাঁদের অভিনয় করা তো দূর, অভিনয় দেখতে আসারও অধিকার ছিল না। ফলে বারান্দাদের সন্তানরাই নাটকে অভিনয় করতে এলেন। আর যেসব ধনীর সন্তানরা নাটক দেখতে এলেন তাঁরা নটীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পায়ে বিলিয়ে দিতেন শত শত সম্পত্তি। বারান্দা মায়েরা দেখলেন এতে

বেশ সুবিধা আছে। নিজেদের সৃণিত জীবন থেকে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের দূরে রাখতে থিয়েটারের আশ্রয় নিলেন। উপপত্নী হয়ে অসম্মানের জীবন যাপনের থেকে থিয়েটার করে নিজের রোজগারে চলা ভাল, তাঁরা তাই মেয়েদের থিয়েটার করতে এগিয়ে দিলেন। বারান্দা পরিবার থেকে উঠে আসায় এই সব মেয়েদের মধ্যে স্বাভাবিক নারীসুলভ জড়তা কিছুটা হলেও কম থাকত। তাঁরা সহজেই শত শত পুরুষের সামনে বেরিয়ে এসে অভিনয়ের কলাকৌশল প্রদর্শন করতে পারতেন। বারান্দাদের ক্ষণিক মুক্তির স্থল ছিল থিয়েটার। ভদ্র ঘরের মেয়েরা না এলেও বারান্দারা নিয়মিত থিয়েটার দেখতে আসতেন। থিয়েটার দেখতে এসে তাঁরা বুঝলেন থিয়েটারে ছলা-কলা দেখিয়ে বাবুদের মন জয় করা কতখানি সহজ আর তার জন্য দেহ দানও করতে হয় না। দেহদান ছাড়াই রোজগারের এই পন্থা তাঁদের মনে ধরে। থিয়েটারকে আশ্রয় করে সম্মানের সঙ্গে অর্থ উপার্জনের এই রাস্তা তিনকড়ির জন্য বেছে নেন তিনকড়ির মা। তিনকড়ির মা নিয়মিত থিয়েটার দেখতেন। বেঙ্গল থিয়েটারে মা ‘রাবণবধ’ নাটক দেখতে যাচ্ছে শুনে বালিকা তিনকড়িও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার বায়না ধরে। বালিকার জেদের কাছে হার মেনে শেষ পর্যন্ত তাঁর মা তিনকড়িকে থিয়েটারে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। স্বয়ং গিরিশ ঘোষ এই নাটকে রামের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তাঁর অভিনয় দেখে অভিভূত তিনকড়ি নিজে অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। থিয়েটারে প্রবেশ করা তখন সহজ ছিল না। তিনকড়ির মা আশঙ্কা প্রকাশ করেন মেয়ে নাচতে, গাইতে জানে না থিয়েটার কর্তারা কি তিনকড়িকে গ্রহণ করবেন? তিনকড়ির মা তারপর থেকে মেয়েকে থিয়েটারে দেওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। চেষ্টা করতে করতে পাঁচ ছয় বছর কেটে যাওয়ার পর তিনকড়ির থিয়েটারে প্রবেশের সুযোগ ঘটে। তাঁদের বাড়ির কাছে এক ব্যক্তি স্টার থিয়েটারে অভিনয় করতেন তাঁর হাত ধরে তিনকড়ি স্টারে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে স্টারে ‘রূপ সনাতন’ নাটকের মহলা চলছিল সেখানে বেশ কিছুদিন তিনকড়ির কাজ ছিল কেবল বসে বসে সকলের অভিনয় দেখা। কিন্তু এতেই তিনকড়ি এবং তাঁর মায়ের খুশির সীমা থাকে না। অবশেষে তিনকড়ি বিল্বমঙ্গল নাটকে প্রথম একটি সখীর ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ পান।^১ অমৃতলাল বসুর ‘বিবাহ বিভ্রাট’ এবং ‘চোরের ওপর বাটপাড়ী’ এই দুটি প্রহসনে তিনকড়ি সংলাপ বিহীন ছোট দুটি ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রথম সংলাপ বলার সুযোগ পান ‘রূপ সনাতন’ নাটকে একটি সখীর ভূমিকায়। একজন অভিনেত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁর গানটি গাওয়ার সুযোগ হয় তাঁর। এই গানটির উপস্থাপন ভঙ্গি এতটাই ভাল ছিল যে প্রচুর হাততালি পড়ে এবং থিয়েটার কর্তৃপক্ষ এর জন্য খুশি হয়ে তাঁকে সন্দেশ খাওয়ার জন্য একটি টাকা প্রদান করেন। তিনকড়ি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই টাকাটি খরচ করেন নি। শত দারিদ্রের মধ্যেও সেই টাকাটি বহু যত্নে তাঁর কাছে সঞ্চিত থেকেছে। স্টারে প্রায় এক বছর তিনি ছোট ছোট ভূমিকাতেই অভিনয় করে গেছেন। এতে একটি সুবিধা হয়েছিল দর্শকের সামনে উপস্থিত হওয়ার যে জড়তা ছিল সেটি কেটে যায়। এরপর গোপাললাল শীল স্টার থিয়েটার কিনে নিলে স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ঢাকা গিয়ে নাটক করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাঁর মা তাঁকে বিদেশে পাঠাতে রাজী না হওয়ায় তিনকড়ির থিয়েটার অভিনয়ে এইখানে ছেদ পড়ে। এর বেশ কিছু দিন পরে তিনি রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা থিয়েটারে যোগদান করেন। অভিনয় বন্ধ থাকলেও স্টারে করা চরিত্রগুলির নিয়মিত অভ্যাস তিনকড়ি চালিয়ে যান তাই তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এইখানে তিনি প্রথম নায়িকা মীরাবাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। বীণা থিয়েটারে তিনকড়ির অভিনয় দেখে মহেন্দ্রলাল বসু তাঁকে দ্বিগুণ মাইনে দিয়ে এমারেন্ড থিয়েটারে নিয়ে আসেন। গোপাললাল শীল স্টার থিয়েটার কিনে নিয়ে তার নাম দিয়েছিলেন এমারেন্ড থিয়েটার। গোপাললাল ঘোষের থিয়েটারের শখ মিটে যাওয়ার পর তিনি লোক কমানোর সিদ্ধান্ত নেন এই সময় আশানুরূপ মাইনে না পাওয়ার কারণে অপমানিত তিনকড়ি থিয়েটার ছেড়ে দেন। এরপর নীলমাধবঘোষের অনুরোধে তিনি সিটি থিয়েটারে যোগ দেন। এখানে তিনি ‘সরলা’ নাটকে গদাধরের মা, ‘বিল্বমঙ্গল’ নাটকে বণিকপত্নী, ‘চৈতন্যলীলা’ নাটকে ভক্তি, ‘তরুবালায়’ দামিনী, ‘সধবার একাদশীতে’ কাঞ্চন প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করেন। এইখানে জগত্তারিণী নামক অভিনেত্রীর ‘বিবাহ বিভ্রাট’ নাটকে ঝিয়ের ভূমিকা পছন্দ না হওয়ায় তিনি নীলমাধববাবুকে অনুরোধ করে এই ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং সুখ্যাতি লাভ করেন। এই থিয়েটারে থাকাকালীন তিনি নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের সুনজরে পড়েন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ তখন তিনি তিনকড়িকে সেখানে নিয়ে আসেন। মিনার্ভায় তখন ম্যাকবেথের মহলা চলছিল। প্রখ্যাত অভিনেত্রী প্রমদাসুন্দরী লেডী ম্যাকবেথের চরিত্রে মহলা দিচ্ছিলেন কিন্তু তা একেবারেই

গিরিশ ঘোষের মনোমত হচ্ছিল না। কিন্তু যাকে একটি পাট দেওয়া হয়েছে তাঁর কাছ থেকে পাট কেড়ে নেওয়ার রীতি ছিল না। কিন্তু প্রমদাসুন্দরী কিছুতেই পেরে না ওঠায় গিরিশবাবু বিরক্ত হয়ে তিনকড়িকে শিক্ষা দেন, মিনার্ভায় নবাগত তিনকড়ি অচিরেই প্রমদাকে ছাপিয়ে ওঠেন। তিনকড়ির লেডী ম্যাকবেথ সকলের মন কেড়ে নেয়। সংবাদপত্রে তিনকড়িকে নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়। বিদ্বজ্জন মহলে এই নাটকের যথেষ্ট সুনাম হলেও সাধারণ জনগণের কাছে এই নাটক গ্রহণযোগ্য না হয়ে ওঠায় চার-পাঁচ রজনীর পরে এই নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। এরপর গিরিশবাবু ‘মুকুল মুঞ্জরা’ নাটকের অভিনয় করেন এখানে তিনকড়ি তারার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাটকের পর ‘আবুহোসেন’ গীতিনাট্যে তিনি দাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। লেডী ম্যাকবেথ, তারা ইত্যাদিতে অভিনয় করার পর সকলেই ধরে নেয় তিনকড়ি সিরিয়াস অভিনয়েই দক্ষ কিন্তু এই দাইয়ের ভূমিকা দর্শকের সেই ভুল ভেঙে দেয়।

‘জনা’ নাটকে প্রবীরের মৃত্যুর পর উন্মাদিনী জনার ভূমিকায় তিনকড়িকে দেখে মনে হত মূর্তিমতী প্রতিহিংসা যেন মানুষের রূপ ধরে সামনে উপস্থিত। ‘করমেতি বাঈ’তে তিনি বিধবার ভূমিকায় নিরাভরণ হয়ে মঞ্চ অবতীর্ণ হতেন। ‘পান্ডবের অজ্ঞাতবাস’ নাটকে দ্রৌপদির ভূমিকায় কীচকের পদাঘাতে মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর যে ভঙ্গিমায়ে উঠে দাঁড়াতে সেই রকম কোনো অভিনেত্রীর দ্বারাই সম্ভব হয় নি। ‘পান্ডব গৌরবে’ তিনি সুভদ্রার ভূমিকাতেও অভিনয় করেন। সুভদ্রার ভূমিকায় যে গানগুলি ছিল সেগুলির শেষে দর্শকের করতালির শেষ থাকত না। ‘সীতার বনবাস’ নাটকে স্বামী পরিত্যক্ত সীতার ভূমিকায় গান গেয়েও সুখ্যাতি অর্জন করেন। গিরিশচন্দ্র যখন যে থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন তিনকড়িকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন। কোহিনূর থিয়েটারে ‘চাঁদবিবি’ নাটকে ঘোড়ার পিঠে রঘুজিকে বেঁধে নিয়ে তিনকড়ি মঞ্চ প্রবেশ করতেন। এরপরেই তিনকড়ি ধীরে ধীরে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। গিরিশবাবু কোহিনূর থিয়েটার ত্যাগ করে মিনার্ভায় আবার ফিরে এলে তিনি তিনকড়িকেও নিয়ে আসতে চান কিন্তু শরীর সায় না দেওয়ায় তিনকড়ি আর থিয়েটারে যোগ দিতে পারেননি। তিনকড়ি তাঁর সময়ে ‘অভিনয়সম্রাজ্ঞী’ অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন। যে নাটকে তিনি অভিনয় করতেন সেই নাটক সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যেত। তিনি অভিনয় ছেড়ে দিলে সেই নাটকেরই আর কোনো প্রাণ থাকত না।

তিনকড়ি ছিলেন প্রকৃত সাধিকা, অভিনয়ের জন্য তিনি ত্যাগ করেছিলেন ঘোষের আশ্রয়ের বিলাসবহুল জীবন। যে মা এক সময় বারবণিতার ঘৃণ্য জীবন থেকে বের করে এনে তাঁকে সুস্থ জীবন উপহার দিতে চেয়েছিলেন সেই মা-ই লোভে পড়ে, লক্ষ টাকার সম্পত্তি আর গা ভরা গয়নার জন্য তিনকড়িকে ঘোষের বাঁধা মেয়েমানুষ হতে প্রায় বাধ্য করেছিলেন কিন্তু তিনকড়ির জেদের কাছে হার মানতে বাধ্য হন। অল্পজল ত্যাগ করে, মায়ের হাতের প্রহার সহ্য করেও তিনকড়ি থিয়েটার ছাড়তে পারেন নি। তিনি ছিলেন অল্পে সন্তুষ্ট। ভাল পাটের জন্য কখনও লালায়িত হননি। তাঁকে যখন যে পাট দেওয়া হত তিনি খুশি মনে, যত্নের সঙ্গে সেই পাটে অভিনয় করতেন। তিনি বহু দিন ছোটখাট পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করে গেছেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে দীক্ষাগুরুর দেখিয়ে দেওয়া পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন, গিরিশ ঘোষের সুযোগ্য ছাত্রী হয়ে তাঁর দেখানো কৌশলেই অভিনয় করেছেন বহু সময় পর্যন্ত। ফলে অঙ্গভঙ্গিগত অভিনয়েই তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অভিনয়ের চার প্রকার ভেদের মধ্যে দেহ ভঙ্গিমার সাহায্যে অভিনীত আঙ্গিক অভিনয়কেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। অসীম শিক্ষানবিশী অধ্যাবসায় নিয়ে তিনি বহুকাল পর্যন্ত কেবল অভিনয় শিক্ষা করে গেছেন। যেখানে সামান্য নাম হলেই অভিনেত্রীরা নিজেদের খুশিমত চলতে আরম্ভ করেন সেখানে গিরিশ ঘোষের প্রিয়পাত্রী হয়েও গুরুর দেখানো পথেই অভিনয় করে গেছেন। নিজের পছন্দ মত পাট নেওয়ার জন্য লালায়িত হতেও তাঁকে দেখা যায়নি। রঙ্গমঞ্চের জন্য বিলাসবহুল জীবনযাপন ত্যাগ, অতি অল্পে সন্তুষ্ট, অভিনয় গুরুর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ এবং সর্বোপরি অনন্য সাধারণ আঙ্গিক অভিনয়ের জন্য উনিশ শতকের এই অভিনেত্রী চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এরপর আসি ‘ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ স্টেজ’, ‘সাইওনারা’ ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত সর্ব কালের সেরা, সমকালীন সময়ের নয়নের মণি, গিরিশ ঘোষের পরম স্নেহধন্যা ও ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আশীর্ব্বাদধন্যা শ্রীমতি বিনোদিনী দাসীর প্রসঙ্গে। দশ-এগারো বছর বয়স থেকেই তিনি থিয়েটারে যোগ দেন। শৈশবে বিনোদিনী অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থার মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছেন। মা এবং দিদিমার সঙ্গে থাকাকালীন তাঁদের আয়ের একমাত্র উৎস ছিল কয়েকটি খোলার ঘরের ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভাড়ার টাকাটুকু। তাঁর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় শৈশবেই তাঁর একটি সুদর্শন বালকের সঙ্গে বিবাহ

হয়েছিল। কিন্তু সেই বিবাহ বেশিদিন কার্যকর হয়নি। বরের গুরুজনেরা তাঁকে অন্যত্র নিয়ে চলে যান এবং পরবর্তী কালে অন্যত্র বিবাহও দিয়ে দেন। ভাড়াটিয়াদের মধ্যে গঙ্গামণি নামে এক বাইজী ছিলেন তাঁর গানের গলা অত্যন্ত মধুর, বিনোদিনী তাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই গঙ্গামণি তখন ন্যাশনাল থিয়েটারে কাজ করতেন। তিনি বিনোদিনীদের দুর্দশা দেখে তাঁর দিদিমাকে প্রস্তাব দেন -

“তোমার নাটনীটিকে থিয়েটারে দেবে? এখন জলপানি বলে কিছু টাকা পাবে। তারপর কাজকর্ম শিখলে একটা মাইনা হবে।”^৩

শেষপর্যন্ত তাঁরই চেষ্টাতে বিনোদিনী মাসিক দশ টাকা মাইনেতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করেন।

এগারো-বারো বছর বয়সে রঙ্গালয়ে প্রবেশ করে তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে স্বেচ্ছায় অভিনয় জগত থেকে সরে যান। তিনি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৩ ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৬ ডিসেম্বর, বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৬ ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৭ জুলাই, ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৭ জুলাই থেকে ১৮৮৩ জুলাই এবং স্টার থিয়েটারে ১৮৮৩ জুলাই থেকে ১৮৮৬ ডিসেম্বর অবধি অভিনয় করেছেন। এই চারটি থিয়েটারে তাঁর বারো বছরের অভিনয় জীবন কেটেছে।

তাঁর মঞ্চে পদার্পণ ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ‘শত্রু সংহার’ নাটকে। এই নাটকে তিনি দ্রৌপদির সখীর একটি ছোট ভূমিকায় সামান্য কিছু সংলাপ বলার সুযোগ পান। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় নাটক অভিনয়ের দিন হল ভর্তি মানুষ দেখে বিনোদিনী ভয়ে কাঁপতে থাকেন। তিনি মঞ্চে প্রবেশ করার সাহস পাচ্ছিলেন না, সেই সময় তাঁকে এক প্রকার ঠেলে মঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে যেভাবে শেখানো হয়েছিল ঠিক সেইভাবে কোনো রকমে সংলাপটি বলে তিনি মঞ্চে থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু সংলাপ ছোট হলেও সংলাপটির সঙ্গে তাঁর অঙ্গভঙ্গি এতই সুন্দর ছিল যে দর্শকের করতালি পড়ে। সাজঘরে সবাই বালিকা বিনোদিনীর প্রশংসা করেন। এরপর নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে তাঁকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ন্যাশনাল থিয়েটারের ‘হেমলতা’ নাটকে হেমলতার ভূমিকায় বিনোদিনী সুযোগ পান। নবাগতা অভিনেত্রীর পক্ষে এই পাট যথেষ্ট কঠিন, তাঁকে অভিনয়ের পাঠ দিতে থাকে কর্তৃপক্ষকে অধিক পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু বিনোদিনীর অধ্যবসায় দেখে সকলেরই মনে হয় এই মেয়ে পাটটা মন্দ করবে না এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পাটটা মন্দ করেননি।

হেমলতার অভিনয় শিক্ষা গ্রহণের এই সময় কালকে নিয়ে পরে বিনোদিনী মন্তব্য করেছেন -

“এই হেমলতার অভিনয় শিক্ষা লাভের সময় আমার হৃদয় যেন উৎসাহ ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। আমি কার্যস্থান হইতে বাড়ীতে আসিলেও, সেই সকল ভাব আমার মনে আঁকা থাকিত। তাঁহারা যেমন করিয়া বলিয়া দিতেন, যেমন করিয়া ভাবভঙ্গী সকল দেখাইয়া দিতেন, সেই সকল যেন আমার খেলার সঙ্গিনীদের ন্যায় চারি দিকে ঘিরিয়া থাকিত।”^৪

গিরিশচন্দ্রের অভিনয় শিক্ষাকে নিজের খেলার সঙ্গিনীর মতন করে আপন করে নিয়েছিলেন বিনোদিনী। আর সেটা পেরেছিলেন বলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রঙ করে নিয়েছিলেন অভিনয়ের সমস্ত সেরা কৌশলগুলি। গিরিশ বাবু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন -

“যাঁহারা বিনোদিনীর ন্যায় অভাগিনী, কুৎসিত পস্থা ভিন্ন যাহাদের জীবনোপায় নাই, মধুর বাক্যে যাহাদিগকে ব্যাভিচারীরা প্রতিদিন প্রলোভিত করিতেছে, তাহারাও মনে মনে আশ্রাসিত হইবে যে যদি বিনোদিনীর মত কায়মনে রঙ্গালয়কে আশ্রয় করে, তাহা হইলে এই ঘৃণিত জন্ম জনসমাজের কার্যে অতিবাহিত করিতে পারিবে। যাহারা অভিনেত্রী তাহারা বুঝিবে কিরূপে মনোনিবেশের সহিত নিজ ভূমিকার প্রতি যত্ন করিলে জনসমাজের প্রশংসা ভাজন হইতে পারে।”^৫

শিক্ষাগুরুর এই বাক্যকে বিনোদিনী বেদ বাক্য মেনেছিলেন। জীবনে প্রায় তিন-চারজন প্রতিষ্ঠিত পুরুষের রক্ষিত হয়ে থাকলেও কায়মনোবাক্যে সেবা করে গেছেন থিয়েটারের। একজন পুরুষের আশ্রয়ে থাকাকালীন সময়ে থিয়েটারের জন্য অন্য পুরুষের শয়্যা সঙ্গিনী হতে হয়েছে। গিরিশ ঘোষের অনুরোধে এক পুরুষের আশ্রয় ছেড়ে মারোয়াড়ী ধনকুবের গুর্মুখ রায় মুসাদ্দীর সঙ্গে থেকেছেন। পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রলোভন ত্যাগ করে সেই টাকায় থিয়েটার তৈরিতে সায় দিয়েছেন।

সেই সময়ে আমাদের নাট্য চেতনার মধ্যে ব্রিটিশ প্রভাব যথেষ্ট। ইংরেজদের মত করে প্রসেনিয়াম মঞ্চে নাটক করতে না পারলে জাতে ওঠা যায় না। সেই যে দেশি যাত্রাপালার ঢঙের নাটককে মাইকেল ‘অলীক কুনাট্য রঙ্গ’ বলেছিলেন তারপর থেকে উনিশ শতকের নাট্যধারা পুরোপুরি বিলেতি ছাঁচে নিজেকে সাজিয়ে নেয়। গিরিশ ঘোষও বিলেতি ধরনকেই তাঁর নাট্য নির্দেশনার আদর্শ বলে মানতেন। প্রচুর ইংরেজি নাটকের বই তিনি নিয়মিত পড়তেন। বিনোদিনীর আত্মকথা থেকে জানা যায় –

“গিরিশবাবু আমাকে পাট অভিনয় জন্য অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। তিনি প্রথম পাটগুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর পাট মুখস্থ করিতে বলিতেন। তাহার পর অবসর মত আমাদের বাটিতে বসিয়া, অমৃত মিত্র, অমৃতবাবু (ভূনীবাবু) আরো সম্ভ্রান্ত লোকে মিলিয়া নানাবিধ বিলাতি অভিনেত্রীদের, বড় বড় বিলাতী কবি সেক্সপীয়ার, মিলটন, বায়রণ, পোপ প্রভৃতির লেখা গল্পছলে শুনাইয়া দিতেন। আবার কখন তাঁদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। নানাবিধ হাবভাবের কথা এক এক করিয়া শিখাইয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ যত্নে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অভিনয় কার্য শিখিতে লাগিলাম।”^৬

এইভাবে বিনোদিনী একেবারে চরিত্রের সঙ্গে তদগত হয়ে অভিনয়ের পথ খুঁজে পেলেন। তিনি বলছেন –

“গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সং উপদেশ গুণে আমি যখন স্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াইতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আমি অন্য কেহ। আমি যে চরিত্র লইয়াছি আমি যেন নিজেই সেই চরিত্র।”^৭

বেঙ্গল থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘মৃগালিনী’ অভিনয়ের সময় বিনোদিনী মনোরমা সাজতেন। এই ভাবে চরিত্রের সঙ্গে মিশে যাওয়ার গুণ রঙ করতে পেরেছিলেন বলেই এই চরিত্রে একাধারে গম্ভীর সহধর্মিনী ও চঞ্চলা বালিকার দুটি ভিন্ন রূপ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। হেমচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন করতে করতে একবার তিনি স্নেহশীলা বোনের মত দাদাকে সমবেদনা জানাচ্ছেন আবার পরক্ষণেই পুকুরে হাঁস দেখতে যাওয়ার জন্য বায়না করছেন একেবারে বালিকার মত। বঙ্কিমচন্দ্র এই অভিনয় দেখে বলেছিলেন তিনি মনোরমাকে শুধু লেখাতেই ধরেছিলেন এইবার যেন সত্যিকারের নিজের চোখে দেখলেন।^৮

বিনোদিনীর অভিনয়ের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয় চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ অভিনয়ের সময়। গুরুমুখ রায়ের হাত থেকে স্টার থিয়েটার গিরিশ ঘোষের হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার পর থিয়েটারকে লাভের মুখ দেখানোর উদ্দেশ্যে গিরিশ বাবু ‘চৈতন্যলীলা’ নাটক লেখেন। এই নাটকের মহলা চলার সময় অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক পরম বৈষ্ণব শ্রী শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় মাঝে মাঝে উপস্থিত থেকে বারবণিতার অভিনয়ের ফলে চৈতন্যদেবের মত যুগ পুরুষের চরিত্র পরিস্ফুটনে কোনো ত্রুটি যাতে না ঘটে তাতে লক্ষ রাখতেন। তিনি বিনোদিনীকে গৌর পাদপদ্ম চিন্তনের পরামর্শ দেন কারণ তিনি পতিতপাবন, তাঁর কৃপালাভ হলে সব কিছু সুচারু ভাবে সম্পন্ন হবে। মহাপ্রভুর কৃপা লাভ তাঁর হয়েছিল। এই বিষয়ে বিনোদিনী বলছেন–

“আমি মনে মনে বুঝিতে পারিলাম যে ভগবান আমায় কৃপা করিতেছেন, কেন না সেই বাল্যলীলার সময় – ‘রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশি’ বলিয়া গীত ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন একটা শক্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যখন মালিনীর নিকট হইতে মালা পরিয়া তাহাকে বলিতাম ‘কি দেখ মালিনী?’ সেই সময় আমার চক্ষু বহির্দৃষ্টি হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আমি হৃদয়ের মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম যেন দেখিতাম।”^৯

অন্তরে গৌর কৃপা লাভ আর বাইরে কৃপা লাভ হয়েছিল অগণিত দর্শকের। সেই দর্শকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। বিনোদিনীর অভিনয়ে মুগ্ধ রামকৃষ্ণদেব সাজঘরে গিয়ে তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে কানে গুরু মন্ত্র

দিয়েছিলেন ‘হরি গুরু, গুরু হরি’। বিনোদিনীর পতিত জীবনে পতিতোদ্ধারিনী জাহুবীর স্পর্শ এসে লেগেছিল সেই দিন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই মন্ত্রকে অন্তরে ধারণ করেছিলেন তিনি।

এই নাটকটির দ্বিতীয় ভাগ কিছুদিন পরে রচিত ও অভিনীত হয়। দ্বিতীয় ভাগের অভিনয় ছিল আরও কঠিন। সেখানে বিনোদিনীর বড় বড় স্পীচের মত ডায়লগ ছিল। যা মুখস্থ করে তাঁর মাথা যন্ত্রণার সমস্যা হয়। সার্বভৌম ঠাকুরের সঙ্গে সাকার ও নিরাকারবাদ নিয়ে তর্কের একটি অংশ ছিল যেখানে চৈতন্যদেব ষড়ভুজ মূর্তি ধারণ করতেন। সেই অংশের অভিনয় অত্যন্ত কঠিন, একেবারে আত্মবিস্মৃত হওয়া আবশ্যিক ছিল। গলার স্বর নিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাত এই অবস্থায় তাঁর একেবারে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার মত অবস্থা হত। তারপর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করে ‘ওই আমার কালাচাঁদ’ বলে সহসা ছুটে যাওয়া এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে একাধারে শারীরিক ও মানসিক কসরতের চূড়ান্ত হত। এই সময়ে একই সঙ্গে অমৃতলাল বসুর ‘বিবাহবিভ্রাট’ নাটকেরও অভিনয় হত। সেখানে একেবারে বিপরীত একটি চরিত্র। উনিশ শতকের শিক্ষিত হিন্দু সমাজ বিরোধী নারী বিলাসিনী কারফরমার চরিত্র করতে হত বিনোদিনীকে। এমনও হয়েছে একই রাতে একসঙ্গে ‘চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ’ ও ‘বিবাহ বিভ্রাটের’ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছে। এরপর এরকম বহু ক্ষেত্রেই তাঁকে একই রজনীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছে।

মাত্র বারো বছরের অভিনেত্রী জীবনে তিনি পঞ্চাশটি নাটকে ষাটটিরও ভূমিকায় বেশি অভিনয় করেছেন। চৈতন্যদেব ছাড়া তাঁর অভিনীত আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল - ‘দক্ষযজ্ঞ’ নাটকে সতীর ভূমিকায় অভিনয়। এই নাটকেও একাধারে অবুঝ বালিকা ও অন্যদিকে পতিগতপ্রাণা সহধর্মিণীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হত তাঁকে। প্রথমে বালিকার বেশে এসে মাকে জিজ্ঞেস করতে হত - ‘বিয়ে কি মা?’ আবার পরক্ষণেই পতিনিন্দায় ব্যাকুলতা ও প্রাণত্যাগ স্তরে স্তরে অভিনীত হয়ে রসের উন্মেষ ঘটাত। গিরিশ ঘোষ রচিত ‘বুদ্ধদেব চরিত্র’ নাটকেও এই রকম একটি চরিত্রেরই দুই বিপরীত অবস্থা দেখাতে হত। গোপার ভূমিকায় অভিনয় করে প্রথমে অসাধারণ সুন্দরী রাণীর বেশে মঞ্চে প্রবেশ করতেন কিন্তু পরে যখন ছন্দকের কাছে স্বামীর পোশাক চাইতেন তখন তাঁর আলুথালু ভিখারিণীর বেশ। এই রকম সম্পূর্ণ দুই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার মূলে ছিল রূপসজ্জা বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান। যেকোনো চরিত্রকে প্রথমে যথাযথ সাজসজ্জা ও পরে যথার্থ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলে তারপর একেবারে একাগ্র তন্ময়তায় ডুব দিতেন চরিত্রের ভাবজগতে।

থিয়েটারের জন্য আত্ম সম্মান বিসর্জন দিয়ে যে ধনী পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন বিনোদিনী পরিবারের চাপে তিনি থিয়েটার ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তখন তিনি থিয়েটারের অর্ধেক সত্ত্ব বিনোদিনীকে দিয়ে যেতে চান। কিন্তু একজন বারবণিতা থিয়েটারের মালিক হবে এটা সেই সময়ে দাঁড়িয়ে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। যে থিয়েটারের জন্য এক সময় মাথায় করে ঝুড়ি নিয়ে মাটি বয়েছেন সেই থিয়েটারকে চোখের জলে বিদায় জানিয়ে তিনি সরে গেছেন অঙ্ককার ঘরের কোণে। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই এই স্বেচ্ছা নির্বাসনের পথ বেছে নেন তিনি। তারপর এক বাবুর আশ্রিতা হয়ে প্রায় গৃহবধূর জীবন কাটিয়েছেন। জীবন সায়াহ্নে তাঁর দিন কেটেছে গোপালের সেবায়, সন্ন্যাসী বেশে।

উনিশ শতকে গিরিশ বাবুরা নাট্য নির্মাণের ক্ষেত্রে বিলেতি ধাঁচকেই মান্যতা দিয়েছিলেন। বিনোদিনীর স্মৃতিচারণ থেকেও আমরা তা পাই। তবে আমাদের দেশীয় নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়কে যে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তা হল - আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহাৰ্য। আঙ্গিক হল অঙ্গভঙ্গি, বাচিক স্বরগামের ওঠানামা, আর আহাৰ্য মঞ্চসজ্জা - এই সকল কিছুর সমন্বয়েই একটি অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। তবে সমস্ত কিছুর মধ্যে যেটি সেরা তা হল সাত্ত্বিক অভিনয়। অভিনেতা যে চরিত্রে অভিনয় করছেন, নিজের ব্যক্তিগত সত্ত্বাকে ভুলে গিয়ে সেই চরিত্রের সত্ত্বটিকে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করার মাধ্যমেই অভিনেতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। বিনোদিনী প্রথমে গিরিশ বাবুর অভিনয় প্রত্যক্ষ করে অভিনয় শিখেছিলেন। তখন গিরিশ বাবুর শেখানো পথে বিলেতের বড় বড় অভিনেত্রীদের হাঁটাচলা, কথা বলার ধরন, স্বরগামের ওঠানামা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতেন। এইভাবে আঙ্গিক অভিনয়কে প্রত্যক্ষ করে এবং সাধনার দ্বারা তা রপ্ত করে তিনি সু অভিনেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। এই অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ‘চৈতন্যলীলা’র মত নাটকে যখন তিনি সুযোগ পেলেন তখন অভিনয় রপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গৌর পাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। ফলে অভিনয় করতে করতে যেন সাক্ষাৎ গৌর সুন্দরের দেখা

পেলেন নিজেই মধ্যে। ব্যক্তিগত সত্ত্বাকে ভুলে গিয়ে নিজেই হয়ে উঠলেন গৌর সুন্দর। এরপর একে একে ‘দক্ষযজ্ঞের’ ‘সতী’ বা ‘বুদ্ধচরিত্রে’র ‘গোপা’ যে চরিত্রেই তিনি অভিনয় করুন না কেন নিজেকে ছাপিয়ে গিয়ে হয়ে উঠতেন ঠিক সেই চরিত্রটি। আবার যখন একই রজনীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই চরিত্রে তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছে তখনও তিনি সামান্য সময়ের ব্যবধানে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন দুই পৃথক সত্ত্বার চরিত্রকে। অভিনয়ের সার সাত্ত্বিক অভিনয়ের স্তরে পৌঁছাতে না পারলে কেবল আঙ্গিক অভিনয় দিয়ে এই রকম অত্যাশ্চর্য প্রদর্শন সম্ভব নয়। গুরুর প্রতি নিষ্ঠা, থিয়েটারের প্রতি সমর্পণ এবং সর্কেরাপরি অভিনয়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বিনোদিনীর প্রতিভাকে এমন স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল যেখানে আঙ্গিক, বাচিক বা আহাষের স্তর পেরিয়ে তা সাত্ত্বিক অভিনয়ের চরমোৎকর্ষের রূপ লাভ করে।

Reference:

১. বসু, বিষ্ণু, নাট্যমঞ্চঃ নারী/ লৌকিক উদ্যান – মানবী সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮৮
২. বিদ্যাভূষণ, উপেন্দ্রনাথ, তিনকড়ি বিনোদিনী তারাসুন্দরী, রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৯৮-১০১
৩. গুপ্ত, দেবনারায়ণ, বাংলার নটনটী, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৩০
৪. বিদ্যাভূষণ, উপেন্দ্রনাথ, তিনকড়ি বিনোদিনী তারাসুন্দরী, রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৪
৫. বিদ্যাভূষণ, উপেন্দ্রনাথ, তিনকড়ি বিনোদিনী তারাসুন্দরী, রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৯
৬. দাসী, বিনোদিনী, আমার কথা ও অন্যান্য রচনা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ২৯
৭. দাসী, বিনোদিনী, আমার কথা ও অন্যান্য রচনা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৩০
৮. দাসী, বিনোদিনী, আমার কথা ও অন্যান্য রচনা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৩২
৯. বিদ্যাভূষণ, উপেন্দ্রনাথ, তিনকড়ি বিনোদিনী তারাসুন্দরী, রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৪৯